আমাদের গাণিতিক মহাবিশ্ব

ম্যাক্স টেগমার্ক

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মহমুদ

প্রথম অধ্যায়

বাস্তবতার পরিচয়

... গাছ মূলত বায়ু দিয়ে তৈরি। জ্বালানো হলে এরা আবার বায়ুতে মিশে যায়। আর এর তপ্ত শিখার মাধ্যমে অবমুক্ত হয় সূর্যেরই উত্তাপ, যা শুষে নিয়ে বায়ু হয়েছিল গাছ। আর ছাইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে বায়ু থেকে না আসা ছোট্ট ধ্বংসাবশেষটুকু। সেটা এসেছিল নিরেট পৃথিবী থেকে।

—রিচার্ড ফাইনম্যান

হে হোরাশিও, তোমার দর্শ্নে স্বপ্নে দেখা জিনিসের চেয়ে আকাশ ও পৃথিবীতে বেশি জিনিস রয়েছে।

— উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, হ্যামলেট, অঙ্ক ১, দৃশ্য ৫

**যা মনে হচ্ছে তা নয়**

এক সেকেন্ড পর আমার মৃত্যু হলো। সাইকেলে পা চালানো বন্ধ করলাম। ব্রেক কষলাম শক্ত করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখা গেল। দেখা গেল শক্ত শিকের দেয়াল। ৪০ টন স্টিলের গগনবিদারী প্যাঁ-পোঁ শব্দ। এ যেন আধুনিক যুগের এক ড্রাগন। ট্রাক ড্রাইভারের চোখের আতঙ্কটা খেয়াল করলাম। আমার মনে হলো, সময় যেন থেমে গেছে। আর আমার জীবনটা আমার সামনে দিয়েই শেষ হয়ে গেল।জীবনের শেষ চিন্তাটা ছিল, "খোদা, এটা যেন এক দুঃস্বপ্ন হয়।" কিন্তু হায়! হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, ঘটনাটা ছিল পরম বাস্তব।

কিন্তু আমি কীভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে এটা কোনো স্বপ্ন নয়? এমনও তো হতে পারত যে এই ঘটনার ঠিক আগে কোনো একটি ঘটনা ঘটেছে শুধুই স্বপ্নের জগতে। এই যেমন ধরুন আমার মৃত শিক্ষক ইনগ্রিড জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় আমার বাইকের পেছনে বসে আছেন। অথবা ধরুন, পাঁচ সেকেন্ড আগে আমার দৃষ্টি ক্ষেত্রের উপরের বাম কোণায় একটি জানালা খুলে গেল। যেখানে লেখা আছে, “তুমি কি নিশ্চিত যে ডানে না তাকিয়ে মাটির নীচের এই সড়ক থেকে বের হওয়া ঠিক হবে?” চাইলেই হয়ত ঐ লেখার উত্তরে “ঠিক আছে” বা “আচ্ছা বাদ” অপশনে ক্লিক করা যেত। দ্য ম্যাট্রিক্স ও দ্যা থার্টিন্থ ফ্লোরের মতো মুভুগুলো খুব বেশি দেখলে হয়ত আমি ভাবতে শুরু করতাম, আমরা পুরো জীবনটা কম্পিউটারে তৈরি কোনো সিমুলেশন বা নকল রূপ কি না। বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে মৌলিক কিছু ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম। তবে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। আমার সমস্যাটা নিশ্চিত জেনেই মৃত্যুবরণ করলাম। আর যাই হোক, ৪০ টনের একখানা ট্রাকের চেয়ে আর অকাট্যা ও বাস্তব জিনিস আর কী হতে পারে?

তবে শুরুতে দেখে যেমন মনে হয় সবকিছু কিন্তু তেমন হয় না। ট্রাক বা বাস্তবতার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। এই কথা শুধু দার্শনিক ও বিজ্ঞান কল্পলেখকরা বলেন তা কিন্তু নয়। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষায় এমন ধারণার দেখা মেলে। এক শতক ধরেই পদার্থবিদরা জানেন, কঠিন স্টিলের বেশিরভাগই ফাঁকা। এর পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের ৯৯.৯৫% ভাগ ভরই ছোট ছোট বল (ক্ষুদ্র গোলক) দিয়ে গঠিত। যা পুরো আয়তনের মাত্র ০.০০০০০০০০০০০০১%। তবুও প্রায় ফাঁকা এই স্টিলকে কঠিন মনে হয় কারণ এই নিউক্লিয়াসগুলোকে ধরে রাখা বৈদ্যুতিক বল অত্যন্ত শক্তিশালী। এছাড়াও অতিপারমাণবিক কণাদেরেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এরা একইসাথে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে। বিষয়টি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের খুব পরিচিত একটি ধাঁধা। (সপ্তম অধ্যায়ে আমরা এটি নিয়ে জানব) কিন্তু আমিও তো এই কণাগুলো দিয়েই তৈরি। তাহলে তারা এক সঙ্গে দুই জায়গায় থাকতে পারলে আমিও কি পারি না? এবং আসলে দূর্ঘটনার প্রায় তিন সেকেন্ড আগে আমি অবচেতন মনে ভাবছিলাম আমি বাঁয়েই তাকাব না ডানেও তাকাব। আমার সুইডিশ হাইস্কুল ব্লেইকবার্গস জিমন্যাশিয়ামে যাওয়ার পথে আমি সবসময় বাঁয়ে দেখতাম। কারণ রাস্তার এই মোড়টিতে কখনোই গাড়ির ভিড় থাকত না। ১৯৮৫ সালের সেই সকালে আমার দূর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্তটা আমাকে নিয়ে গেল মৃত্যুর কাছে। শেষ পর্যন্ত ফলাফল নির্ভরশীল হয়ে পড়ল একটিমাত্র ক্যালসিয়াম পরমাণুর ওপর। পরমাণুটি আমার মস্তিষ্কের অগ্রসম্মুখ কর্টেক্সের সিন্যাপ্সের একটি নির্দিষ্ট সংযোগস্থলে প্রবেশ করলে একটি নির্দিষ্ট নিউরন একই বৈদ্যুতিক সঙ্কেত প্রেরণ করবে।যেটা থেকে মস্তিষ্কের অন্য নিউরনের মাধ্যমে ঘটবে এক গুচ্ছ নির্দিষ্ট ঘটনা। যেগুলোর সম্মিলিত বার্তা হবে, “ব্যাপার না।”

অতএব সেই ক্যালসিয়াম পরমাণুটি একসঙ্গে একটু আলাদা দুটি জায়গায় অবস্থান করতে পারে, তাহলে অর্ধসেকেন্ড পরে আমার চোখের মণি একসঙ্গে দুটো আলাদা দিকে দৃষ্টি দিতে পারত। দুই সেকেন্ড পরে আমার বাইকখানা একসঙ্গে দুটো আলাদা জায়গায় থাকত। আর খুব বেশি সময় পার হবার আগেই আমি একই সাথে মারা যেতাম ও বেঁচে যেতাম। এটা আসলেই ঘটে কি না তা পৃথিবীর বড় বড় কোয়ান্টাম পদার্থবিদরা গুরুত্বের সাথে তর্ক করছেন। এটা ঘটে থাকলে আমাদের জগৎ সমান্তরাল মহাবিশ্বে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেখানে থাকবে আলাদা আলাদা ইতিহাস। বিজ্ঞানীরা আরও তর্ক করছেন শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ নিয়েও। কোয়ান্টাম চলাচলের এই সমীকরণকে সংশোধন করা দরকার কি না তা নিয়ে।

তাহলে আমি মি সত্যিই মারা গেলাম? এই নির্দিষ্ট মহাবিশ্বে আমি অল্প একটুর জন্যেই মারা গেলাম। কিন্তু সমানভাবে বাস্তব আরেকটি মহাবিশ্বে কি আমি মারা গেলাম? যেখানে এই বইটিই লেখা হয়নি? আমি মৃত ও জীবিত দুটোই হয়ে থাকলে সবকিছুকে অর্থবহ করে তুলতে বাস্তবতার সংজ্ঞা আমরা নতুন করে দিতে পারি কি?

এতক্ষণ আমি যা বললাম তা হয়ত খুবই অদ্ভুত লেগেছে। পদার্থবিদ্যাকে হয়ত বিষয়টি আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। তবে বিষয়টিকে আমি নিজে কীভাবে অনুভব করেছি তা বললে বিষয়টি আরও বেশি অদ্ভুত ঠেকবে। আমি দুটি সমান্তরাল মহাবিশ্বের দুটি আলাদা জায়গায় থাকলে আমার একটি রূপ বেঁচে থাকবে। ভবিষ্যতে আমি যত উপায়ে মারা যেতে পারি তাদের ক্ষেত্রেও আপনি এই যুক্তি দিতে পারেন। এতে করে মনে হচ্ছে, অন্তত একটি সমান্তরাল বিশ্বে হলেও আমি সবসময় মৃত্যু থেকে বেঁচে যাব। আমি যেখানে বেঁচে আছি, আমার চেতনার উপস্থিতিও সেখানেই। তাহলে এর অর্থ কি এটাই যে এক অর্থে আমি অমর? তাহলে কি আপনিও এক অর্থে অমর নন? তাহলে তো এক সময় হয়ে যাবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেব।

আপনি কি ভেবে অবাক হচ্ছেন যে আমরা বাস্তবতাকে যতটা বিস্ময়কর মনে করতাম, পদার্থবিদ্যাকে একে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছে? তবে ডারউইনীয় বিবর্তনকে গুরুত্বের সাথে নিলে একে অতটা বিস্ময়কর মনে হয় না। বিবর্তন আমাদেরকে কিছু বিষয় বুঝতে সহায়তা করেছে। তবে সেগুলো শুধু পদার্থবিদ্যার সেসব বিষয়গুলো নিয়ে যেগুলো আমাদের দূরের পূর্বপুরুষদের টিকে থাকার সংগ্রামের সাথে জড়িত ছিল। যেমন, নিক্ষিপ্ত পাথরের পরাবৃত্তীয় পথ (যার মাধ্যমে বেসবলের প্রতি আমাদের ঝোঁক থাকার কারণ বোঝা যায়)। বস্তু মৌলিকভাবে কী দিয়ে তৈরি সেটা নিয়ে ভাবতে থাকা গুহাবাসী কোনো মহিলা হয়ত বুঝতেই পারবে না তার পেছনে বাঘ সাক্ষাৎ মৃত্যুর বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। ফলে ডারউইনের তত্ত্ব একটি পরীক্ষাযোগ্য পূর্বাভাস দিচ্ছে। মানবীয় মাপকাঠির বাইরের বাস্তবতা বোঝার জন্যে প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই আমাদের বিবর্তিত আন্তর্জ্ঞান অকেজো হয়ে যাবে। এ পূর্বাভাস অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফলগুলো খুব ভালোভাবে ডারউইনের মতকে সমর্থন করছে। আইনস্টাইন খুব দ্রুত বুঝে ফেললেন, সময় ধীরে চলতে পারে। কিন্তু সুইডিশ নোবেল কমিটির লোকেরা বিষয়টিকে এত অদ্ভুত মনে করল যে তারা তাঁকে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্যে নোবেল পুরস্কার দিতে অস্বীকার করে। নিম্ন তাপমাত্রায় তরল হিলিয়াম উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে। আবার উচ্চ তাপমাত্রায় সংঘর্ষে রত কণারা পরিচয় পাল্টে ফেলে। ইলেকট্রনের সাথে পজিট্রনের সংঘর্ষে জেড-বোসন তৈরি হতে পারে। একে আমার কাছে গাড়ির সংঘর্ষে নৌকা তৈরি হওয়ার মতোই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে আণুবীক্ষণিক জগতে কণারা একই সাথে দুটি জায়গায় উপস্থিত থাকে। আগে উল্লিখিত কোয়ান্টাম ধাঁধাগুলো এ কারণেই তৈরি হয়। তবে বড় জগতেও বিস্ময়ের শেষ নেই। যদি আপনি খুব সহজে ব্ল্যাকহোলের সবগুলো বিষয় বুঝে থাকেন, তাহলে আমি মনে করি আপনি সংখ্যালঘুদের একজন। এখনই এই বইটি পড়া বন্ধ করে আপনার উচিত হবে তাড়াতাড়ি আপনার গবেষণার ফল প্রকাশ করে ফেলা। যাতে আবার আগেই কেউ সেটা করে না ফেলে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্বের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়ে যায়। আরও বড় মাপকাঠিতে গেলে পাবেন আরও বড় আরও বড় বিস্ময়কর জিনিস। আমাদের সেরা টেলিস্কোপ দিয়েও আমরা যে বাস্তবতা দেখি, সত্যিকারের বাস্তবতা তার চেয়েও বিশাল। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখব, মহাবিশ্বের শুরুর দিকে ঘটনার নাম মহাজাগতিক স্ফীতি। এটা থেকে বোঝা যায়, স্থান শুধু অনেক অনেক বড়ই, এটা আসলে অসীম। যাতে আছে আপনার অসীম সংখ্যক প্রতিরূপ। তার চেয়ে বেশি প্রায় আপনার মতোই দেখতে প্রতিরূপ। দুটো ভিন্ন ধরনের সমান্তরাল মহাবিশ্বে আছে আপনার সম্ভাব্য সবরকম ভিন্নরূপ। এই তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে আমার ওপরে বলা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যুক্তি ভুল হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। হয়ত আমার কোনো প্রতিরূপ স্কুলে গিয়েছেই। কিন্তু দূর মহাশূন্যের কোনো সৌরজগতে আরও অসংখ্য আমি ছিলাম। যারা ঐ বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠিক একই রকম উপায়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। আর শেষ মুহূর্তে ডানে না তাকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অন্য কথায়, পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কার বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের বেশিরভাগ মৌলিক ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সেটা ক্ষুদ্র বা বড় দুই জগতের ক্ষেত্রেই সত্য। একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখব, স্নায়ুবিজ্ঞানের (neuroscience) সাহায্যে মস্তিষ্কের কাজ বুঝতে গেলে মাঝামাঝি পর্যায়ের জগতেও বাস্তবতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা আর কাজ করে না।

শেষে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। আমরা জানি, আমাদের গাণিতিক সমীকরণগুলো জগতের কার্যপ্রণালী জানার একটি দরজা উন্মুক্ত করে। ১.১ চিত্রে একটি রূপক চিত্রের মাধ্যমে এটি দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভৌত জগৎ কেন এতটা গাণিতিক নিয়মের মধ্যে বাঁধা? জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহানায়ক গালিলিও গালিলেই তো ঘোষণাই করেছেন, “মহাবিশ্ব গণিতের ভাষা দিয়ে লেখা”। নোবেল লরেট ইউজিন উইগনার জোর দিয়ে বলেছেন, ভৌত বিজ্ঞানের ঘটনার ব্যাখ্যায় গণিত অবিশ্বাস্য রকম ফলপ্রসূ। শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছেন, এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়াই এই বইটির মূল উদ্দেশ্য। দশম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা হিসাব-নিকাশ, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও মনের মধ্যকার অভিনব সম্পর্ক নিয়ে কথা বলব। শুনলে পাগল বলবেন এমন একটি ধারণাও আমি প্রকাশ করব। সেটা হলো, আমাদের ভৌত জগৎ শুধু গণিতের মাধ্যমে প্রকাশিতই নয়, এটা নিজেই গণিত। আমরা হলাম বিরাট গাণিতিক বস্তুর আত্ম-সচেতন অংশবিশেষ। আমরা দেখব, এর মাধ্যমে নতুন ও চূড়ান্ত এক গুচ্ছ সমান্তরাল মহাবিশ্ব পাওয়া যায়। এগুলো এত ব্যাপক ও এত অদ্ভুত যে একটু আগে বলা অদ্ভুত কথাগুলোকে খুব স্বাভাবিক মনে হবে। যার ফলে আমরা বাস্তবতা সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের লালিত বহু ধারণা বাদ দিতে বাধ্য হব।

চিত্র ১.১

পদার্থবিদ্যার সমীকরণ দিয়ে বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখি, সমীকরণগুলো বিন্যাস ও নিয়মতান্ত্রিকতা প্রদর্শন করে। তবে আমি মনে করি গণিত নিছক বাইরের জগতের একটি দরজাই নয়। এই বইতে আমি বলব, আমাদের আমাদের ভৌত জগৎ শুধু গণিতের মাধ্যমে প্রকাশিতই নয়, এটা নিজেই গণিত। আরও সঠিক করে এটি একটি গাণিতিক কাঠামো।

চূড়ান্ত প্রশ্নটা কী?

আমাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর বুকে যতদিন ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে তার শুরু থেকেই নিঃসন্দেহে তারা ভেবেছে বাস্তবতা নিয়ে। অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছে। কোথা থেকে এল সবকিছু? এর সবকিছু কীভাবে শেষ হবে? এটা কতটা বিশাল? প্রশ্নগুলো এতটাই মোহনীয় যে পুরো পৃথিবীর সব সংস্কৃতির মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভেবেছে। তৈরি হয়েছে সৃষ্টি নিয়ে রূপকথা, গল্প ও ধর্মীয় মতবাদ। ১.২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলো এত কঠিন যে সব মানুষ একমত হতে ব্যর্থ হয়েছে। সকল সংস্কৃতির মানুষ ঐকমত্যে এসে চূড়ান্ত সত্য খুঁজে পাওয়ার বদলে তাদের উত্তরের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা গেছে। অন্তত কিছু কিছু পার্থক্য তাদের জীবনপ্রণালীর পার্থক্যেরই বহিঃপ্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন মিশরের সৃষ্টিরহস্যের রূপকথার কথা বলা যায়। নীলনদ সেখানে ভূমিকে উর্বর রাখত। সেখানে মানুষ ভেবেছে, পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটেছে পানি থেকে। আমাদের সুইডেনে আবার ভিন্ন মত পাওয়া যায়। এখানে টিকে থাকার সংগ্রামে আগুন ও বরফের ভাল ভূমিকা ছিল। নর্স পুরাণে বলা হয়েছে, প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে আগুন ও বরফ থেকে। কী আশ্চর্য!

চিত্র ১.২

আমরা এই বইয়ে যেসব মহাজাগতিক প্রশ্ন নিয়ে কথা বলব তার অনেকগুলোই চিন্তাশীলদেরকে যুগ যুগ ধরে ভাবিয়েছে। কিন্তু মানুষ একমত হয়ে কোনো উত্তরে আসতে পারেনি। উপরের শ্রেণিবিভাগটি করা হয়েছে ২০১১ সালে আমার কসমোলজি ক্লাসের অংশ হিসেবে এমআইটির গ্র্যাজুয়েন্ট ছাত্র ডেভিড হার্নান্দেজের একটি প্রদর্শনী অনুসারে। এমন সরলধর্মী শ্রেণিবিভাগ তৈরি করা এক কথায় অসম্ভব। তাই চিত্রটিতে পুরোপুরি সঠিক নয়। অনেক ধর্মেরই বহু শাখা ও ব্যাখ্যা আছে। কিছু কিছুকে আবার একের বেশি শাখায়ও রাখা চলে। উদাহরণ হিসেবে হিন্দু ধর্মের কথা বলা যায়। যে তিন ধরনের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তার সব কয়টিই হিন্দু ধর্মে পাওয়া যায়। একটি কাহিনী অনুসারে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা (চিত্রে দেখানো) ও আমাদের মহাবিশ্ব উভয়েই এসেছে একটি ডিম্ব থেকে। ডিম্বটা আবার হয়ত এসেছে পানি থেকে।

প্রাচীন মানুষরা অন্য যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবত সেগুলোও অন্তত একই রকম মৌলিক। *বাস্তবতা কী? আমরা খালি চোখে যা দেখি তার চেয়ে বাস্তব কিছু কি আছে?* দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে প্লেটোর উত্তর হচিল হ্যাঁবোধক। এটা নিয়ে তার বিখ্যাত একটি তুলনা হলো গুহা উপমা। তিনি এখানে মানুষকে তুলনা করেছিলেন আজীবন গুহায় বন্দী মানুষের সাথে। যারা এক শূন্য দেয়ালের পেছনে আটকে আছে। দেখছে পেছন থেকে আসা জিনিসের ছায়া। আর ভুল করে ধরে নিচ্ছে এই ছায়াগুলোই পরিপূর্ণ বাস্তবতা। প্লেটোর মতে আমরা মানুষরা যাকে নিত্যদিনের বাস্তবতা বলে মনে করি, সেটাও একইভাবে সত্যিকারের বাস্তবতার একটি সীমিত ও বিকৃত রূপ মাত্র। আর সেই সত্যিকারের বাস্তবতাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে মানসিক শিকল থেকে নিজদেরকে মুক্ত করতে হবে।

পদার্থবিদ হয়ে আমি যদি কিছু শিখে থাকি, সেটা হলো, প্লেটো ঠিকই বলেছিলেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যার বদৌলতে এটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকৃতি দেখে যেমন মনে হয় আসলে তেমন নয়। কিন্তু আমরা যাকে বাস্তবতা মনে করতাম, এটা যদি সেটা না হয়, তাহলে এটা কী? আমাদের মনের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা আর বাহ্যিক বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক কী? শেষ পর্যন্ত ভাবলে সবকিছু আসলে কী দিয়ে তৈরি? এর সবকিছু কীভাবে কাজ করে? কেন? এতসব কিছুর কি কোনো অর্থ আছে? আর থাকলে সেটা কী? ডগলাস অ্যাডামস *দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি* নামে একটি রসাত্মক সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন। সেখানে একটি প্রশ্ন আছে এমন, “জীবন, মহাবিশ্ব ও সবকিছুর চূড়ান্ত প্রশ্নটির উত্তর কী?”

যুগে যুগে চিন্তাশীলরা “বাস্তবতা কী?” প্রশ্নটির চমকপ্রদ সব উত্তর দিয়েছেন। কেউ কেউ উত্তর দেওয়া চেষ্টা করেছেন। কেউ আবার প্রশ্নটিকেই উড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে কিছু উল্লেখ করছি (এই তালিকাকা পূর্ণাঙ্গ দাবি করব না। একটির সাথে আরেকটির মিলও থাকতে পারে)।

এই প্রশ্নটির উত্তর জানাই এই বইটির (এবং আমার বৈজ্ঞানিক জীবনের) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অংশ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চিন্তাবিদরা এত ভিন্ন ধরনের নানান উত্তর দেওয়ার অন্যতম কারণ হলো, তারা প্রশ্নটিকে ভিন্নভাব এব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাই আমিও আপনাদের কাছে বলতে বাধ্য, আমি একে কীভাবে ব্যাখ্যা করছি। কীভাবে দেখছি। *বাস্তবতা* কথাটার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। এটা দ্বারা আমি বুঝি, আমরা বাইরের যে ভৌত জগতের অংশ তার চূড়ান্ত ধরন। একে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্যে আমি উদগ্রীব। সেটা আমি কীভাবে করি?

হাই স্কুলে থাকার সময় এক সন্ধ্যায় আমি আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্প *ডেথ অন্য দ্য নাইল*  পড়ছিলাম। মনে কষ্ট নিয়ে আমি জানতাম, সকাল সাতটায় আমার অ্যালার্ম বাজবে। কিন্তু ভোর চারটার দিকে রহস্যের সমাধান হওয়ার আগে আমি বইটি রেখে দিতে পারিনি। শিশুকাল থেকেই গোয়েন্দাগল্পের প্রতি আমার অপ্রতিরোধ্য টান ছিল। বয়স প্রায় ১২ হলে আমি সহপাঠী অ্যানড্রিস বিট, ম্যাথিয়াস বথনার, ও ওলা হ্যানসনকে নিয়ে আমি একটি গোয়েন্দা ক্লাব শুরু করি। কখনোই অপরাধী আমরা ধরতে পারিনি। কিন্তু রহস্য সমাধানের চিন্তাটা আমার কল্পনার জগতকে দখল করে ফেলে। আমার কাছে মনে হয়, “বাস্তবতা কী?” প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা গল্প। এর পেছনে এতটা সময় দিয়ে পেরে আমার নিজেকে অবিশ্বাস্য রকম ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। সামনের অধ্যায়গুলোতে আমি আরও কিছু ঘটনার কথা বলব, যেখানে কৌতূহল আমাকে ভোর পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিল। রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি একেবারেই ঘুমাতে পারিনি। শুধু পার্থক্য হলো, আমি বই পড়ছিলাম না। দেখছিলাম নিজের লেখা। লিখছিলাম এক গাদা গাণিতিক সমীকরণ। জানতাম, এগুলো থেকে একটি উত্তর আমি খুঁজে পাব।

|  |  |
| --- | --- |
| * “বাস্তবতা কী?”প্রশ্নের কিছু উত্তর | |
| প্রশ্নটির একটি অর্থপূর্ণ উত্তর আছে | * চলাচলরত মৌলিক কণাসমূহ * মাটি, বায়ু, আগুন, বাতাস ও নির্যাস * চলাচলরত পরমাণু * চলাচলরত স্ট্রিং বা তন্তু * বক্র স্থানকালে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র * এম-থিওরি (এম-এর বদলে আপনার প্রিয় অন্য অক্ষরও বসাতে পারেন) * একটি স্বর্গীয় সৃষ্টি * একটি সামাজিক কাঠামো * একটি স্নায়ুশারীরিক কাঠামো * একটি স্বপ্ন * তথ্য * একটি সিমুলেশন বা নকল রূপ (দ্য ম্যাট্রিক্স মুভির মতো) * একটি গাণিতিক কাঠামো * চতুর্থ স্তরের মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্ব |
| প্রশ্নটি অর্থহীন | * একটি বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে। তবে আমরা মানুষরা সেটার পুরোটা জানব না। ইমানুয়েল কান্ট যাকে “দাস ডিঙ আন সিক” (বাস্তবতা আছে, কিন্তু তা মানুষের জানার সীমার বাইরে) বলেছিলেন তা আমরা কখনও নাগালের মধ্যে পাব না। * মৌলিকভাবে বাস্তবতাকে জানা অসম্ভব * আমরা একে জানিই না শুধু, একে জানলেও সেটা প্রকাশও করতে পারব না। * বিজ্ঞান একটি গল্প মাত্র (জ্যাক ডেরিডা ও অন্যদের আধুনিক যুগোত্তর জবাব) * বাস্তবতার পুরোটাই রয়েছে আমাদের মাথায় (গঠনবাদী উত্তর) * বাস্তবতার কোনো অস্তিত্ব নেই (আত্মজ্ঞানবাদ) |

একজন পদার্থবিদ হওয়ায় আমি পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতার রহস্য সমাধান করতে চাইব। আমার মতে এজন্যে শুরুতেই প্রশ্ন করতে হবে, “আমাদের মহাবিশ্ব কত বড়?” এবং “সবকিছু কী দিয়ে তৈরি?” প্রশ্নগুলোক একেবারেই গোয়েন্দা রহস্যের মতো মনে করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে দেখে যেতে হবে কোন দিকে সূত্র ইঙ্গিত দিচ্ছে।

যাত্রার সূচনা

পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে? এর মাধ্যমে কি আকর্ষণীয় একটি জিনিস বিরক্তিকর হয়ে যাবে না? বিমানে আমার পাশে বসা যাত্রী যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কী করি, তখন আমার কাছে দুটো উত্তর থাকে। কথার বলার আগ্রহ থাকলে বলি, “জ্যোতির্বিদ্যা”। এর মাধ্যমে সুন্দর একটি আলোচনার সূচনা হয়ে যায়। কথা বলতে ইচ্ছে না করলে বলি “পদার্থবিদ্যা”। এক্ষেত্রে সাধারণত উত্তর পাই, “ও আচ্ছা, হাই স্কুলের আমার সবচেয়ে খারাপ সাবজেক্ট।”বাকি পথ আর আমার সাথে কোনো কথা হয় না।

আসলে স্কুলে আমার কাছে সবচেয়ে কম প্রিয় সাবজেক্ট ছিল পদার্থবিদ্যা। পদার্থবিদ্যার প্রথম ক্লাসটির কথা আজও মনে আছে। একগেঁয়ে ও বিষণ্ণ সুরে স্যার বললেন ঘনত্ব পড়াবেন। ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ দিলে ঘনত্ব পাওয়া যায়। তাহলে ভর যদি এত হয় ও আয়তন অত হয়, তাহলে ঘনত্ব হবে তত। আমার মাথায় আসলে কিছুই ঢোকেনি। আর যখনি কোনো পরীক্ষা কাজ করত না, তিনি আদ্রতাকে দোষ দিয়ে বলতেন, “আজ সকালেও কাজ করেছে।”আমার বন্ধুর শুরুত্ব বুঝতে পারেনি কেন আসলে পরীক্ষা কাজ করত না। পরে ওরা দেখল, আমি দুষ্টুমি করে ওসিলোস্কোপের নীচে চুম্বক লাগিয়ে রেখেছি। (টিভির মতো পর্দায় বিদ্যুৎপ্রবাহের তারতম্য তরঙ্গ রেখার আকারে দেখার যন্ত্রকে ওসিলোস্কোপ বলে- অনুবাদক)…

অবশেষে কলেজে আবেদন করার সময়। আমি পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য ব্যবহারিক সাবজেক্ট নিতে চাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ভর্তি হলাম স্টকহোম সকুল অব ইকোনোমিক্সে। মন দিলাম পরিবেশগত বিষয়ের দিকে। আমাদের গ্রহটিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকা রাখার ইচ্ছে ছিল। আমার মতে আমাদের প্রযুক্তিগত সমাধানের অভাব নেই। বরং আমরা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি না। আমি বুঝলাম, মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করার সেরা উপায় হলো তাদের ব্যয়কে প্রভাবিত করা। একটি বুদ্ধি মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। অর্থনৈতিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অহংবাদকে সার্বিক কল্যাণের সাথে একই সুতোয় গেঁথে দিতে হবে। আফসোস! অল্প দিনের মাথায়ই আমি ভুল বুঝতে পারলাম। আমার মনে হলো, অর্থনীতি মূলত এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক গণিকাবৃত্তি। শাসকগোষ্ঠী যেটা শুনতে চায় সেটা বললে আপনি পুরষ্কার পাবেন। একজন রাজনীতিক কিছু করতে চাইলে তিনি উপদেষ্টা হিসেবে এমন একজন অর্থনীতিবিদ পেয়ে যান যে কি না ঠিক কাজটির পক্ষেই যুক্তি তুলে ধরে। ফ্র্যাংকলিন ডি রুজভেল্ট সরকারি ব্যয় বাড়াতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি শুনলেন জন মেনার্ড কিনিসের কথা। রোনাল্ড রিগ্যান ব্যয় কমাতে চাওয়ায় শুনেছিলেন মিল্টন ফ্রিডম্যানের কথা।

এরপর আমার সহপাঠী জোহান ওল্ডহফ আমাকে যে বইটি দিল সেটি পাল্টে দিল সবকিছু: *শিউরলি ইউ আর জোকিং, মি. ফাইনম্যান!* রিচার্ড ফাইনম্যানের সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর কারণেই আমার পদার্থবিদ্যার দিকে চলে আসা। বইটি অবশ্য আসলে পদার্থবিদ্যা নিয়ে ছিল না। এর বিষয়বস্তুগুলো ছিল এমন: কীভাবে সঠিক তালা কিনতে হবে, কীভাবে মেয়েদেরকে খুঁজে নিতে হবে। তবে আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকটা পদার্থবিদ্যা ভালবাসে। আমি আকৃষ্ট হলাম। সাদামাটা একজন মানুষকে সুদর্শনা এক মহিলার সাতেহ হাঁটতে দেখলে আপনি হয়ত ভাববেন, কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে। ধরে নেওয়া যায়, মহিলাটি লোকটির মধ্যে গোপন কোনো গুণ খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ করে পদার্থবিদ্যাকেও আমার কাছে তেমন মনে হলো। ফাইনম্যান কী এমন দেখেছেন যা আমি স্কুলে দেখতে পাইনি?

এই রহ্যসের সমাধান করতেই হবে। অতএব, *ফাইনম্যান লেকচারস অন্য ফিজিক্স-*এর প্রথম খণ্ড নিয়ে বসে পড়লাম। এটা পেয়েছিলাম বাবার বইয়ের তাকে। শুরু করলাম পড়া: “কোনো দূর্যোগের ফলে সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হারিয়ে গেলে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটিমাত্র বাক্য রেখে যাওয়ার সুযোগ থাকলে কোন বাক্যের মাধ্যমে সবচেয়ে অল্প কথায় বেশি তথ্য রেখে যাওয়া যাবে?”

আরে! এই লোকটা তো আমার স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকের মতো না! ফাইনম্যান আরও বললেন, “আমার বিশ্বাস, এটা হলো […] সবকিছু পরমাণু দিয়ে তৈরি। ছোট ছোট যে কণাগুলো অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে। সামান্য দূরে গেলে যারা একে ওপরকে আকর্ষণ করে। আর কাছাকাছি চেয়ে এলে করে বিকর্ষণ। ”

মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। পড়েই চললাম। আর মুগ্ধ হতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল ধর্মীয় আবেগ পাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেলাম ভালবাসা। হঠাৎ করেই বুঝে ফেললাম, কোন জিনিসের অভাব ছিল এতদিন। যেটা ফাইনম্যান বুঝেছিলেন। বুদ্ধি চর্চার চূড়ান্ত পন্থা হলো পদার্থবিদ্যাই। মহাবিশ্বের বড় বড় রহসগুলো সমাধানের পথ এটাই। আকর্ষণীয় কিছুকে পদার্থবিদ্যা নিরস বানিয়ে ফেলে না। কোনো কিছুকে আরও পরিষ্কার করে দেখতে সাহায্য করে বরং। আমাদের চারপাশে জগতকে আরও সুন্দর ও অভিনব করে তুলে ধরে। শরৎকালে বাইকে চড়ে কাজে যাওয়ার সময় আমি গাছের মধ্যে লাল, কমলা ও সোনালী আভা দেখি। তবে পদার্থবিদ্যার চোখ দিয়ে গাছগুলোকে দেখলে আরও বেশি সুন্দর লাগে। এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা ফাইনম্যানের উদ্ধৃতিটা সে কথাই বলছে। যতই গভীরে তাকাই, ততই আমি চাকচিক্য দেখি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখব, গাছের মূল উৎস নক্ষত্র। অষ্টম অধ্যায়ে দেখব, কীভাবে তাদের মৌলিক উপাদান থেকে সমান্তরাল মহাবিশ্বে তাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত মেলে।

ঐ সময় আমার বান্ধবী রয়েল ইনস্টিটিটিউট অব টেকনোলজিতে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়ছিল। আমার কাছে নিজের বইয়ের চেয়ে ওর বইগুলোই ভাল লাগত। আমাদের সম্পর্ক বেশি দিন টেকেনি। কিন্তু পদার্থবিদ্যার প্রতি আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে। সুইডেনে কলেজে পড়তে কোনো বেতন দিতে হয় না। তাই স্টকহোম স্কুল অব ইকোনোমিক্সকে না বলেই আমি ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার দ্বৈত গোপন জীবন চলতে লাগল। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো আমার গোয়েন্দা অনুসন্ধান। সিকি শতক বছর পরে লেখা এই বইটি সেই অনুসন্ধানেরই একটি প্রতিবেদন।

তাহলে বাস্তবতার মানে কী দাঁড়াল? এই অধ্যায়ের এমন নাম দিয়ে হয়ত বাড়াবাড়ি করেছি। অবশ্য আপনাদেরকে একটি চূড়ান্ত উত্তর দিয়ে ফেলতে পারব ভেবে সেটা করিনি (যদিও বইয়ের শেষের অংশে আমরা কিছু চমকপ্রদ সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলব)। বরং কাজটি আমি করেছি আমার অনুসন্ধানের ব্যক্তিগত অভিযানে আপনাদেরকে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে। মনকে প্রশস্ত করা কিছু রহস্য নিয়ে আমার উত্তেজনা ও চিন্তা ভাগাভাগি করার উদ্দেশ্যে। আমার মনে হয়, আমার মতোই আপনারাও শেষে মনে করবেন, বাস্তবতা যাই হোক না কেন, আমরা একসময় যা ভাবতাম এটা তার চেয়ে অনেক আলাদা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একেবারে কেন্দ্রীয় ও দারুণ এক ধাঁধা এটি। আমি আশা করছি, আমার মতো আপনারাও পার্কিং টিকেট ও হার্টের ব্যথার মতো দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। সমস্যাগুলোকে আরও সহজ করে দেখতে পারবেন। জীবনকে উপভোগ করার দিকে মনে দিতে পারবেন। রহস্যগুলো নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে ভাবতে পারবেন।

এই বইটির বিষয়গুলো নিয়ে আমি আমার বর্তমান বুক এজেন্ট জন ব্রোকম্যানের সাথে কথা বললে তিনি সাথে সাথে সায় দিলেন। তিনি বললেন, “আমি কোনো টেক্সটবুক চাই না, আমি চাই আপনার বই।”ফলে এই বইটি এক ধরনের বৈজ্ঞানিক আত্মগাঁথা। অবশ্য এখানে আমার নিজের চেয়ে পদার্থবিদ্যার কথা বেশি আছে। তবে এটি আবার জনপ্রিয় বিজ্ঞানের আদর্শ কোনো বইও নয়। নির্দিষ্ট কোনইও পদার্থবিদ্যাকে নিয়ে জরিপ চালানোর চেষ্টা এতে করিনি। সমাজের ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করিনি। সব বিপরীত মতকে সমান সমান সুযোগও দেইনি। বরং বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকৃতি জানার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এটি। আমি আশা করছি, আমার চোখ দিয়ে দেখতে আনন্দ পাবেন আপনি। আমার কাছে যে সূত্রগুলোকে সবচেয়ে দারুণ মনে হয় সেগুলোকে আমরা একসঙ্গে দেখব। আমরা এর অর্থ বের করার চেষ্টা করব।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে “বাস্তবতা কী?” প্রশ্নটি বদলে গেছে। এটার আলোচনার মাধ্যমেই আমরা অভিযান শুরু করব। সবচেয়ে বড় (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়) থেকে সবচেয়ে ছোট (সপ্তম থেকে অষ্টম অধ্যায়) মাপকাঠিতে বাহ্যিক বাস্তবতা সম্পর্কে পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় জানা যাচ্ছে। “আমাদের মহাবিশ্ব কত বড়” এই প্রশ্নটি আলোচনা করব বইয়ের প্রথম ভাগে। ক্রমেই মহাবিশ্বের বড় কাঠামোর দিকে যেতে যেতে এই প্রশ্নটির চূড়ান্ত উত্তর খুঁজব আমরা। অনুসন্ধান করব আমাদের নিজদের মহাজাগতিক উৎসও। জানব দুই ধরনের সমান্তরাল মহাবিশ্ব সম্পর্কে। আমরা ইঙ্গিত পাব যে স্থান আসলে গাণিতিক জিনিস। বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে “সবকিছু কী দিয়ে তৈরি?” প্রশ্নটির পেছনে আঠার মতো লেগে থাকব আমরা। আমরা চলে যাব ক্ষুদ্র অতিপারমাণবিক জগতে। এখানে আমরা দেখব তৃতীয় এক ধরনের সমান্তরাল মহাবিশ্ব। এখানেও আমরা ইঙ্গিত পাব যে বস্তুর চূড়ান্ত উপাদানও এক অর্থে গাণিতিক জিনিস। বইয়ের তৃতীয় ভাগে আমরা এক কদম পেছনে আসব। আমরা চিন্তা করে দেখব বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকৃতি সম্পর্কে এই সবকিছু কী রায় দেয়। প্রথমেই আমরা বলব, চেতনাকে বুঝতে পারার ব্যর্থতা বাহ্যিক ভৌত বাস্তবতাকে পুরোপুরি বোঝার ক্ষেত্রে বাধা নয়। আমরা এরপরে সবচেয়ে মৌলিক ও বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করব। বিষয়টি হলো, চূড়ান্ত বাস্তবতা পুরোপুরিই গাণিতিক। দৈব ঘটনা, জটিলতার মতো পরিচিত ধারণাগুলোকেও আমরা পরিত্যাগ করব। এদেরকে বিভ্রমের পর্যায়ে নামিয়ে আনব। আমরা সমান্তরাল মহাবিশ্বের চতুর্থ ও চূড়ান্ত স্তরের ইঙ্গিত প্রদান করব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা অভিযান শেষ করে আনব। ফিরে আসব ঘরে। মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো মানুষ ও ব্যক্তিগতভাবে আপনার জন্যে কী বয়ে আনবে সেটা জানার চেষ্টা করব আমরা। ১.৩ নং চিত্রে আমি অভিযানের একটি পরিকল্পনা দিয়েছি।এটা পড়ার কিছু কৌশলও এতে বলা আছে। দারুণ একটি ভ্রমণ আমাদের সামনে। চলুন শুরু করি!

চিত্র ১.৩

বইটি কীভাবে পড়বেন। ... ...

সারসংক্ষেপ

আমার মনে হয় পদার্থবিদ্যা আমাকে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি শিখিয়েছে সেটি হলো, বাস্তবতা আসলে যাই হোক আন কেন, এটাকে দেখে যেমন মনে হয় তার থেকে সেটা অনেক অনেক আলাদা।

বইটির প্রথম অংশে আমরা দৃষ্টিকে বড় করে ভৌত কাঠামোকে বড় স্কেলে দেখব। দেখব গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, সুপারক্লাস্টার এবং আমাদের মহাবিশ্ব ও দুই স্তরের সম্ভাব্য সমান্তরাল মহাবিশ্ব।

বইটির দ্বিতীয় অংশে দৃষ্টিকে ছোট করে এনে ছোট স্কেলে ভৌত বাস্তবতার স্বরূপ দেখব। পরমাণু ও তার চেয়েও ছোট মৌলিক উপাদানগুলো দেখব। দেখ তৃতীয় স্তরের একটি সমান্তরাল মহাবিশ্ব।

তৃতীয় অংশে আমরা এক ধাপ পেছনে আসব। দেখব অদ্ভুত এই ভৌত বাস্তবতার চূড়ান্ত রূপ। শেষে পরীক্ষা করে দেখব যে এটি সম্ভবত একেবারেই গাণিতিক ব্যাপার। বিশেষ করে একটি গাণিতিক কাঠামো, যা একটি চতুর্থ ও চূড়ান্ত স্তরের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অংশ।

বাস্তবতার ধারণা প্রত্যেক মানুষের কাছে আলাদা। এর দ্বারা আমি বুঝি যে বাইরের ভৌত জগতের আমরা অংশ তার চূড়ান্ত প্রকৃতি। আমার শিশুকাল থেকেই আমি একে বোঝার অন্বেষণ নিয়ে উৎসাহিত ও বিমোহিত বোধ করেছি।

এই বইটি হলো বাস্তবতার প্রকৃতি বোঝার জন্যে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিযাত্রা। চলুন না আমার সাথে।

লেখকের নোট

১। অনেক সময় আলোচনা এভাবে শুরু হয়: “ও জ্যোতিষবিদ্যা! আমার রাশি কন্যা।” তারপর আমি যখন আরও সঠিক করে বলি “কসমোলজি,” তখন উত্তর পেয়েছি, “ও আচ্ছা, কসমেটোলজি!” যা অ্যাস্ট্রোলজি (জ্যোতিষবিদ্যা) ও কসমোলজিকে গুলিয়ে বানানো হয়। তারপর প্রশ্ন আসে আইলাইনার ও মাসকারা নিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাশূন্যে আমাদের অবস্থান

মহাশূন্য অনেক বড়। সত্যিই বড়। আপনার বিশ্বাসই হবে না এটা কতটা অসামান্য ও বিস্ময়কর রকম বড় এটি।

-ডগলাস অ্যাডামস, দ্য হিচহাইকার'স গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি

মহাজাগতিক প্রশ্ন

একজন ছাত্র ক্লাসে হাত তুলল। মাথা নেড়ে অনুমতি দিলাম। প্রশ্নটি হলো, “স্থানের কি শেষ আছে?”

শুনে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। বাহ! বাচ্চাদের সামনে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ছোটখাট একটি লেকচার দিয়ে থেমেছিলাম। আয়োজনটি ছিল।উইনচেস্টারে স্কুলের পড়া শেষে। কিন্টারগার্ডেনের দারুণ মেধাবী এই বাচ্যগুলো মেঝেতেই বসে কথা শুনছিল। দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা। অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্যে। আর পাঁচ বছরের এই বাচ্চাটি আমাকে এমন এক প্রশ্ন করে বসেছে যার উত্তর আমি দিতে পারি না। আসলে আমাদের গ্রহের কেউই এর উত্তর দিতে পারবে না। অথচ এটি নৈরাশ্যের জন্ম দেওয়ার মতো অধিবিদ্যার**\*১** কোনো প্রশ্ন নয়। এটা সত্যিকারের একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। একটু পরেই আমি যেসব তত্ত্বের কথা বলব সেগুলো দিয়ে এটি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে চলমান নানান পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশ্নটির উত্তর আরও খোলাসাও হচ্ছে। আসলে আমি মনে করি, আমাদের ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে এটি আসলেই দারুণ একটি প্রশ্ন। পঞ্চম অধ্যায়ে গেলে আমরা দেখব, এই প্রশ্নটি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সমান্তরাল মহাবিশ্বের দিকে নিয়ে যাবে।

বিশ্বের খবরাখবর দেখতে দেখতে কয়েক বছর ধরে আমি মানুষের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই শিশুটি আমাকে মানবজাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা যদি এমন বড় জিনিস চিন্তা করতে পারে তাহলে আমাদের বড়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সঠিক পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নের শক্তিও থাকবে। সে আমাকে ভালো শিক্ষণের গুরুত্বও মনে করিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই কৌতূহল নিয়ে জন্মাই। এরপর স্কুলে যাওয়ার পর কোনো এক সময় সেই জিনিসটি আমরা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। আমার মনে হচ্ছে, শিক্ষক হিসেবে তথ্য পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার মূল দায়িত্ব নয়। বরং দায়িত্ব হলো, প্রশ্ন করার সেই হারানো উৎসাহটুকু ফিরিয়ে দেওয়া।

আমি প্রশ্ন শুনতে ভালোবাসি। বিশেষ করে বড় প্রশ্ন। মজার মজার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সময় কাটাতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এটাকেই আমার কাজ ও জীবনধারণের উপায় বলতে পারাটা আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার, যা আমরা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। যে প্রশ্নগুলো আমি পাই তার মধ্যে সেরা ১৬টি হলো এ রকম:

১. স্থান কীভাবে অসীম না হয়ে থাকতে পারে?

২. সসীম সময়ে অসীম স্থান কীভাবে তৈরি হতে পারে?

৩. মহাবিশ্ব কিসের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে?

৪. স্থানের কোথায় আমাদের বিগ ব্যাং বিস্ফোরণটি ঘটেছিল?

৫. বিগ ব্যাং কি একটিমাত্র বিন্দুতে ঘটেছিল?

৬. মহাবিশ্বের বয়স যদি মাত্র ১৪ শ কোটি বছরই হয় তাহলে আমরা ৩ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তু কীভাবে দেখি?

৭. গ্যালাক্সিরা বা ছায়াপথরা আলোর চেয়ে বেশি বেগে চললে কি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না?

৮. গ্যালাক্সিরা কি আসলেই আমাদের থেকে দূরে সরছে, নাকি নিছক স্থান প্রসারিত হচ্ছে?

৯. মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও কি প্রসারিত হচ্ছে?

১০. বিগ ব্যাং অনন্যতার (ওsingularity) পক্ষে কি প্রমাণ আছে?

১১. স্ফীতির মাধ্যমে প্রায় শূন্য থেকে আমাদের চারপাশের বস্তুর উদ্ভব কি শক্তির সংরক্ষণশীলতার লঙ্ঘন নয়?

১২. কোন জিনিস বি ব্যাং ঘটিয়েছিল?

১৩. বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ছিল?

১৪. মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কী?

১৫. ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি কী?

১৬. আমরা কি নগণ্য?

প্রশ্নগুলোর উত্তর একসাথে বসে ভাবা যাক। পরের চারটি অধ্যায়ে আমরা এগারোটি প্রশ্নের উত্তর দেব। বাকি পাঁচটি প্রশ্নে বেশ কিছু ঘোরপ্যাঁচ আছে। তবে শুরুতে কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাটির প্রশ্নটায় ফিরে যাই। আমাদের বইয়ের প্রথম অংশের মূল ভাব এটাই: স্থানের কি শেষ আছে? ২.১ চিত্রে দেখানো আছে যে বিভিন্ন শতাব্দীতে আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর নাটকীয়ভাবে বড় হয়েছে। বর্তমানে আমরা জানি, আমাদের স্থান শিকার খুঁজে বেড়ানো আমাদের পূর্বপুরুষদের জানা স্থানের চেয়ে অন্তত এক কোটি-কোটি-কোটি গুণ বড়। আসলে তাদের ক্ষেত্রে স্থানের পরিধিটা ছিল সারা জীবনের হেঁটে বেড়ানো স্থানের পরিমাণ। ছবিতে আরও দেখা যাচ্ছে, আমাদের জানা স্থানের পরিমাণ একবারে বড় হয়নি। সেটা হয়েছে বারেবারে। যখনি আমরা মহাবিশ্বকে বড় করে দেখার দেখার সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা আগে যতটুকু স্থান চিনতাম সেটা ছিল আরও বড় কিছুর অংশ।

স্থান কত বড়?

বাবা আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন: “যদি কখনও এমন জটিল প্রশ্নের মুখে পড়ো যার উত্তর তুমি পারছো না, তাহলে তুমি উত্তর দিতে পারবে না এমন আরও সরল একটি প্রশ্ন মোকাবেলা করো। ” উপদেশটা মাথায় রেখে একটা প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করা যাক। আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম কত সাইজের স্থান থাকতে পারে? ২.১ চিত্র বলছে, শতাব্দীর পরবর্তনের সাথে সাথেয়েই প্রশ্নের উত্তর নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে আমরা জানি, শিকার খুঁজে বেড়ানো আমাদের পূর্বপুরুষরা যতটুকু জানতেন, আমাদের স্থান তার চেয়ে অন্তত এক কোটি-কোটি-কোটি গুণ বড়। তারা তো শুধু জানতেন তাদের সারা জীবনে হেঁটে বেড়ানো স্থানটুকুর কথাই। ছবিটি আরও বলছে, স্থানের বিশালতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একদিনে বদলায়নি। বদলেছে বারেবারে। যখনি আমরা মহাবিশ্বকে বড় করে দেখার সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা আগে যা জানতাম তা আসলে আরও বড় কিছুর অংশ। ২.২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে আমাদের আবাসস্থল একটি গ্রহের অংশ। যেটি একটি সৌরজগতের অংশ। সেটা আবার একটি ছায়াপথের অংশ। ছায়াপথ আবার এক ছায়াপথগুচ্ছ নামক এক মহাজাগতিক বিন্যাসের অংশ। সেটা আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অংশ। পরে আমরা যুক্তি দেখাবো, এটাও আবার এক বা একাধিক স্তরের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অংশবিশেষ।

চিত্র ২.১: এই অধ্যায়ে আমরা দেখাবো, আমাদের মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন সীমানা অবিরাম বড় হয়েছে। খেয়াল করুন, এখানে উলম্ব অক্ষের (খাড়া অক্ষ) মানগুলো খুব বড় বড়। প্রতিটি আগের চেয়ে ১০ গুণ বড়।

উটপাখি যেভাবে বালিতে মাথা ডুবিয়ে রাখে আমরা মানুষরাও তেমনি সবসময় ধরে নিয়েছি, আমরা যা দেখছি তাই সব। দম্ভ করে মনে করে নিয়েছি, আমরা আছি মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। ফলে মহাবিশ্বকে বুঝতে গিয়ে আমরা সবসময়ই একে প্রকৃত আকারের চেয়ে ছোট মনে করেছি। তবে ২.১ চিত্রে দেখানো ধারণা দ্বিতীয় আরেকটি চিত্র তুলে ধরছে, যেটা আমাকে খুবই উৎসাহী করে। আমরা শুধু মহাবিশ্বের আকারকেই ছোট মনে করিনি, মহাবিশ্বের আকার বোঝার মানবিক ক্ষমতাকেও ছোট মনে করেছি। আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্কও আমাদের মস্তিষ্কের সমানই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তারা টেলিভিশন দেখতেন না। আমি নিশ্চিত যে তারা প্রশ্ন করতেন, “আকাশে এই জিনিসগুলো কী?” এবং “এগুলো কোথা থেকে এল?” তাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর রূপকথা ও গল্প বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেননি, প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার উপায়টা তাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল। আর এর জন্যে মহাশূন্যে উড়তে শেখার দরেকার ছিল না। মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে জানার জন্য দরকার ছিল মানবিক মনকে উড়তে দেওয়া।

চিত্র ২.২: যখনি আমরা মানুষরা বড় মাপকাঠিতে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা যা জানতাম সেটা আরও বড় কিছুরই অংশ। আমাদের আবাসস্থল একটি গ্রহের (বাঁয়ে) অংশ। সেটি একটি সৌরজগতের অংশ। সেটা আবার অংশ একটি ছায়াপথের (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)। ছায়াপথ আবার ছায়প্তহগুচ্ছ নামক মহাজাগতিক বিন্যাসের অন্তর্ভূক্ত (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ছায়াপথগুচ্ছ আবার আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অংশ (ডানে)। সেটাও হতে পারে এক বা একাধিক স্তরের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অংশ।

ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো সফলতাকে অসম্ভব ধরে নেওয়া এবং সে কারণে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি, পদার্থবিদ্যার অনেকগুলো সাফল্যই আরও আগেই হতে পারত। কারণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তখনই উপস্থিত ছিল। আইস-হকি খেলায় আপনি যদি ভুল করে আগেই আপনার স্টিককে ভাঙা বলে ধরে নেন, তাহলে গোল করতে পারবেন না। পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখবো কীভাবে এমন আত্মবিশ্বাসী ভুলগুলোকে জয় করেছেন আইজ্যাক নিউটন, অ্যালেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান, জর্জ গ্যামো, হিউগ এভারেটরা। অতএব, পদার্থবিদ্যায় নোবেল পাওয়া বিজ্ঞানী স্টিভেন উইবার্গের সাথে আমি একমত: “পদার্থবিদ্যায় অনেক সময়ই এমন হয় যে আমরা আমাদের তত্ত্বকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে নয়, বরং যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে না নিয়েই ভুলটা করি।”

চলুন প্রথমে দেখি কীভাবে পৃথিবীর সাইজ এবং চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও ছায়াপথদের দূরত্ব বের করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে একে আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক এক গোয়েন্দা কাহিনী বলে মনে হয়। আর তর্কযোগ্যভাবে এর মাধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। তাই মূল আলোচনার আগেই প্রাথমিক কৌতূহল মেটানোর জন্যে এটা নিয়ে বলতে আমি খুবই উৎসাহবোধ করছি। পরে আমরা দেখবো কসমোলজির সর্বশেষ আবিষ্কারগুলো। দেখেই বুঝতে পারবেন, প্রথম চারটি উদাহরণে কিছু কোণ পরিমাপের চেয়ে জটিল কিছু নেই। এগুলো দেখে আরও বোঝা যাবে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার গুরুত্ব। হয়ত সেগুলোই হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

চিত্র ২.৩: চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। দুই হাজার বছর আগে চন্দ্রগ্রহণের সময় সামোস দ্বীপের অ্যারিস্টার্কাস চাঁদের সাইজকে পৃথিবীর ছায়ার সাইজের সাথে তুলনা করেছিলেন। এখান থেকে সঠিকভাবে অনুমান করেন, চাঁদ পৃথিবীর প্রায় চারগুণ ছোট। (অ্যান্থনি আয়োম্যামিটিসের তোলা সময়ান্তর ছবি)

পৃথিবীর আকার

জলপথে চলাচল শুরু হলে মানুষ খেয়াল করল, জাহাজের মূল কাঠামো পালের আগেই অদৃশ্য হয়। এটা থেকে মানুষ বুঝল, সমুদ্রপৃষ্ঠ বক্র। আর পৃথিবী গোলাকার। ঠিক চাঁদ ও সূর্যকে দেখে যেমন মনে হয়। প্রাচীন এই কথার সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় তারা দেখল, চাঁদে পৃথিবীর ছায়া হয় গোল। ২.৩ নং চিত্রে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। জাহাজের চলাচল থেকে সহজেই পৃথিবীর সাইজ বের করা যায়। তবে আজ থেকে ২,২০০ বছর আগেই ইরাটোস্থেনিস শুধু কোণের কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সূক্ষ্মভাবে সেটা পরিমাপ করেন। তিনি জানতেন যে উত্তরায়ণের সময় দুপুরবেলা মিশরীয় শহর সাইনিতে সূর্য সোজা মাথার ওপর থাকে। কিন্তু আলেক্সান্দ্রিয়ায় সূর্য থাকে মাথার সোজা উপর থেকে ৭.২ ডিগ্রি দক্ষিণে। আলেক্সান্দ্রিয়ার অবস্থান সাইনি থেকে ৭৯৪ কিলোমিটার উত্তরে। এ থেকে তিনি বুঝলেন, ৭৯৪ কিলোমিটার যাওয়া মানে পৃথিবীর ৩৬০ ডিগ্রি পরিধির ৭.২ ডিগ্রি সমান অতিক্রম করা। তাহএল পৃথিবীর পরিধি হবে ৭৯৪ কি.মি. × ৩৬০০ /৭.২০। বা প্রায় ৩৯,৭০০ কি.মি.। আধুনিক হিসাবে পাওয়া মান ৪০,০৭৫ মিটার তার খুবই কাছাকাছি।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস আরও কম নির্ভুল হিসাবের উপর ভিত্তি করে চলতে গিয়ে হাসির পাত্র হন। তিনি আরবি মাইল ও ইতালীয় মাইলকে গুলিয়ে ফেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, প্রাচ্যে পৌঁছতে হলে তাকে ৩,৭০০ কি.মি. পথ অতিক্রম করতে হবে। অথচ আসলে করতে হত ১৯,৬০০ কি.মি.। হিসাব সঠিকভাবে করলে তিনি এই অভিযাত্রার জন্যে বরাদ্দও পেতেন না। আর আমেরিকার অস্তিত্ব না থাকলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হত না। মানে কোনো কোনো সময় সঠিক হওয়ার চেয়ে ভাগ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চাঁদের দূরত্ব

সূর্য বা চন্দ্রগহণ যুগে যুগে মানুষের মাঝে আতঙ্ক, ভয় ও কল্পকাহিনির জন্ম দিয়েছে। সত্যি বলতে, কলম্বাস জ্যামাইকায় আটকে পড়লে চন্দ্রগ্রহণের পূর্বাভাস বলে দিয়ে স্থানীয়দেরকে ভয় দেখাতে সক্ষম হন। সেটা ছিল ১৫০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির সূর্যগ্রহণ। তবে চন্দগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের আকার সম্পর্কে একটি সুন্দর ক্লু পাওয়া যায়। দুই হাজার বছরের বেশি সময় আগে ২.৩ চিত্রটি দেখেছিলেন। পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে চলে আসলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। এ সময় চাঁদে পতিত পৃথিবীর ছায়ার একটি বক্র প্রান্ত থাকে। আর পৃথিবীর গোল আকৃতি চাঁদে চেয়ে কয়েক গুণ বড়। অ্যারিস্টার্কাস বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছায়াটি পৃথিবীর সত্যিকার আকারের চেয়ে কিছুটা ছোট। কারণ পৃথিবী সূর্যের চেয়ে ছোট। কিন্তু তিনি সঠিকভাবে এই জটিলতার সমাধান করে পরিমাপ করে বলেন, চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৩.৭ গুণ ছোট। ইরাটোস্থেনিস তো পৃথিবীর আকার আগেই বের করে ফেলেছেন। অতএব এখন শুধু তাকে ৩.৭ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। পেয়ে গেলেন চাঁদের পরিধি। আমার মতেই এই মুহূর্তটিতেই মানুষ পৃথিবীর বাইরে গিয়ে মহাশূন্যকে জয় করা শুরু করেছে। অ্যারিস্টার্কাসের আগেও বহু মানুষ চাঁদের দিকে তাকিয়েছে। আর আশ্চর্য হয়ে ভেবছে, চাঁদ না জানি কত বড়! কিন্তু সেটা জানলেন প্রথম অ্যারিস্টার্কাস। আর কাজটি তিনি করলেন মানসিক শক্তি দিয়ে। রকেটের শক্তি দিয়ে নয়।

অনেকসময় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আরেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সহজ করে দেয়। আর এক্ষেত্রে চাঁদের আকার জানার সাথে সাথে জানা হয়ে গেল এর দূরত্ব। আপনার হাতকে বাহুর দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারিত করুন। এবার দেখুন আপনার কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে কতটুকু দৃশ্য বন্ধ করে রাখতে পারেন। আপনার এই আঙ্গুলটি প্রায় এক ডিগ্রি\*২ সমান জায়গা দখল করে। চাঁদকে ঢাকতে এর অর্ধেক জায়গা দরকার হয়। পরেরবার চাঁদ দেখলেই এই ব্যাপারটা দেখে নেবেন। একটি বস্তুকে অর্ধেক ডিগ্রি স্থান দখল করতে হলে একে আপনার থেকে এর আকারের প্রায় ১১৫ গুণ দূরে থাকতে হবে। তার মানে আপনি বিমানের জানালা দিয়ে ৫০ মিটারের (অলিম্পিক সাইজের) একটি সুইমিং পুল আঙ্গুল দিয়ে এভাবে ঢাকতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি ১১৫ × ৫০ মিটার বা ৬ কিলোমিটার উচ্চতায় আছেন। ঠিক এইভাবেই অ্যারিস্টার্কাস চাঁদের আকারকে ১১৫ দিয়ে গুণ করে এর দূরত্ব মাপেন। দেখা যায় সেটি পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৩০ গুণ\*৩।

সূর্য ও নক্ষত্রদের দূরত্ব

তাহলে সূর্য? কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়ে একেও আটকানোর চেষ্টা করুন। দেখবেন, চাঁদের মতো প্রায় সমান জায়গা দখল করছে এটি। প্রায় অর্ধেক ডিগ্রি। অবশ্যই এটি চাঁদের চেয়ে দূরে আছে। কারণ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে দেয়। কিন্তু সূর্য কতটা দূরে আছে? সেটা নির্ভর করে আকারের ওপর। যেমন সূর্য যদি চাঁদের তিন গুণ হয়ে থাকে, তাহলে সমান কোণ পরিমাণ জায়গা দখল করতে হলে একে তিন গুণ বেশি দূরে অবস্থিত হতে হবে।

লেখকের নোট (অনুবাদকের নোটগুলো তারকা চিহ্ন দিয়ে নাম্বারিং করা হয়েছে)

১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় d2/2h, যেখানে d হলো সর্বোচ্চ যে দূরত্বে আপনি h উচ্চতার একটি পালকে সমুদ্র স্তর থেকে দেখতে পারেন।

অনুবাদকের নোট

\*১। অধিবিদ্যা হলো দর্শনের একটি শাখা। এখানে বাস্তবতার (reality) বৈশিষ্ট্য, মন ও বস্তুর সম্পর্ক, বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং সম্ভাবনা ও বাস্তবতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অধিবিদ্যা আসলে দুই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। কী আছে এবং সেটা কেমন?

\*২। পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত ১৮০ ডিগ্রি। তার মানে চাঁদ, সূর্য বা নক্ষত্ররা উদিত হয়ে আবার অস্ত যেতে যেতে ১৮০ ডিগ্রি কোণিক পথ অতিক্রম করে। এই যাত্রাপথেই চাঁদ নির্দিষ্ট কোনো সময়ে অর্ধেক ডিগ্রি স্থান দখল করে।

\*৩। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৪২ কিলোমিটার। আর চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। ভাগ দিলে ৩০ এর একটু বেশি হয়।